#আমি পদ্মজা পর্ব ৩৮

_____

পদ্মজা নূরজাহানের পা টিপে দিচ্ছে। তার মূল উদ্দেশ্য রুম্পার ঘরে যাওয়া। সকাল থেকে বারংবার রুম্পার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছে। পারেনি। মদন কিছুতেই ঢুকতে দেয়নি। তার এক কথা, নূরজাহান না বললে ঢুকতে দিবে না। অগত্যা পদ্মজা নিরাশ হয়ে নূরজাহানের ঘরে এসে পা টিপা শুরু করে। যদি একটু পটানো যায়। ঘন্টাখানেক ধরে সে নূরজাহানের পা টিপছে। হাত ব্যাথায় টনটন করছে। নূরজাহান আয়েশ করে ঘুমাচ্ছেন। কখন যে ঘুম ভাঙবে! এভাবে কেটে যায় আরো অনেক সময়। নূরজাহান চোখ মেলে তাকান। পদ্মজাকে বললেন,'এহনো আছো?'

পদ্মজা মৃদু হাসলো। নূরজাহান বললেন,'অনেকক্ষণ হইছে। যাও, এহন ঘরে

যাও।’
পদ্মজার চোখে মুখে আঁধার নেমে আসে। পরক্ষণেই মিষ্টি করে হেসে বলল, ‘আপনার ভালো ঘুম হয়েছে?’
‘সে হয়েছে।’
‘দাদু একটা প্রশ্ন করি?’
‘করো।’
‘রুম্পা ভাবিকে যেদিন দেখেছিলাম অনেক নোংরা দেখাচ্ছিল। উনাকে পরিষ্কার রাখার জন্য একটা মেয়ে দরকার। কিন্তু সবসময় মদন ভাইয়া পাহারা দেন।’
‘ষাড়ের লাকান শক্তি ওই ছেড়ির। হের লগে ছেড়িরা পারব না। সবাই ডরায়।
‘তাই বলে,এভাবে অপরিষ্কার থাকবে সবসময়।’
‘সবাই ডরায়। কেউ যাইব না সাফ কইরা দিতে। তুমি বেহুদা কথা বলতাছো।’

নূরজাহানের কঠিন কণ্ঠের সামনে পদ্মজার আসল কথাটাই মুখে আসছে না। সে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বলল, ‘আমার মনে হয় আমি পারব। ভাবি আমাকে আঘাত করবে না। আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিতেন যদি।’
‘পাগল হইছো ছেড়ি? কেমনে খামচাইয়া ধরছিল মনে নাই? আর কথা কইয়ো না। যাও এন থাইকা।’

পদ্মজা আর কিছু বলার সাহস পেল না। সে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দুই তলার বারান্দা থেকে আলগ ঘরের সামনের খালি জায়গা দেখা যাচ্ছে। সেখানে গ্রামের মানুষের ভীড়। মজিদ হাওলাদার তার লোকজন নিয়ে গ্রামের মানুষদের সমস্যা শুনছেন। কাউকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছেন, কাউকে বা ধান দিয়ে। এই ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটে। পদ্মজার খুব ভালো লাগে। গর্ব হয়।

_____

পূর্ণা ঘাটে বসে আছে। মাদিনী নদীর জলের স্রোতে তার দৃষ্টি স্থির। প্রান্ত,প্রেমা স্কুলে গিয়েছে। সে যায়নি। ইদানীং সে স্কুলে যায় না একদমই। ভালো লাগে না। পদ্মজা যাওয়ার পর থেকে সব যেন থমকে গেছে। পদ্মজার শূন্য জায়গাটা কিছুতেই পূর্ণা মানতে পারছে না। বাড়ির প্রতিটি কোণে সে পদ্মজার স্মৃতি খুঁজে পায়। এইতো এই ঘাটে বসে দুজন কত সময় পার করতো। কত গল্প করতো। আজ পদ্মজার জায়গা শূন্য। পূর্ণা অনুভব করে,সে তার মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসে পদ্মজাকে। পদ্মজার প্রতিটি কথা কানে বাজে। এতদিন হয়ে গেল,তবুও এই শোক,এই শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে। পূর্ণার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। সে নিচের ঠোঁট কামড়ে দুইবার ডাকল,'আপা...আপারে।'

বাসন্তী দূর থেকে পূর্ণাকে দেখতে পেলেন। জুতা খুলে পা টিপে হেঁটে আসেন। পূর্ণার পাশে বসেন। পূর্ণা এক ঝলক বাসন্তীকে দেখে দ্রুত চোখের জল মুছল। এরপর বলল, ‘আপনি এখানে এসেছেন কেন?’

প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে পূর্ণা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বাসন্তীর দিকে তাকাল। দেখতে পেল, বাসন্তীকে আজ অন্যরকম লাগছে। আরেকটু খেয়াল করে বুঝতে পারল অন্যরকম কেন লাগছে। আজ বাসন্তীর ঠোঁটে লিপস্টিক নেই,কপালে টিপ নেই,চোখে গাঢ় কাজল নেই। থুতুনির নিচে সবসময় কালো তিনটা ফোঁটা দিতেন সেটাও নেই। পূর্ণা বাসন্তীর হাতের দিকে তাকাল। হাতেও দুই-তিন ডজন চুড়ি নেই। দুই হাতে শুধু দুটো সোনার চিকন চুড়ি। পূর্বের প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করে পূর্ণা পাল্টা প্রশ্ন করল, ‘আপনি আজ সাজেননি?’

‘না ছাজলে ভালো লাগে না?’ বেশ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলেন বাসন্তী।

পূর্ণা বাসন্তীর চোখেমুখে স্নিগ্ধতা খুঁজে পেল। মায়াবী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। চকচকে গাল। চল্লিশের উপর বয়স মনেই হয় না। কিন্তু মুখে কিছু বলল না পূর্ণা। সে চোখ সরিয়ে নিল।
বাসন্তী বললেন,’আমার সাথে গপ করবা?’
‘আমার ঠেকা পড়েনি।’ পূর্ণার ঝাঁঝালো স্বর।

বাসন্তী পূর্ণার পাশ ঘেঁষে বসেন। পূর্ণা বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে ফেলল। কিছু কঠিন কথা শোনানোর জন্য প্রস্তুত হলো সবেমাত্র। তখন বাসন্তী বললেন,’আম্মা, আমি তোমার আব্বারে ভালোবাছছিলাম ছত্যি। তবুও ছেছ বয়ছে আইছছা একটা ভুল করে ফেলি। ভুল যখন বুঝতে পারি তোমার আব্বারে বলি। কিন্তু তোমার আব্বা মুখ ফিরাইয়া নিল। আমার তোমার আব্বা ছাড়া আর গতি ছিল না। তাই

গ্রামের মানুছ নিয়া আছছিলাম। আমার এই কাজের জন্যে তোমাদের এতো বড় ক্ষতি হবে জানলে এমন করতাম না। যাক গে ছেছব কথা। তোমার আব্বা আমারে আজও মেনে নেয় নাই। তাতে আমার দুঃখ নাই। তোমার আম্মার মতো একটা ছোট বইন পাইছি। তোমার দুইডা ভাই বইনের মতো ছন্তান পাইছি। আমি নিঃছন্তান। আমার কোনো ছন্তান নেই। কখনো হবেও না। ছন্তানের ছূন্যতা আমাকে খুঁড়ে খুঁড়ে খায়। তোমাদের বাড়িতে আছার পর থেকে সেই দুঃখ ঘুচে গেছে। প্রান্ত,প্রেমা যখন আমারে বড় আম্মা কইয়া ডাকে,আমার খুছিতে কান্দন আইছছা পড়ে। ছুধু ভালো লাগে না তোমার গুমট মুখটা। বিছ্বাস করো আম্মা,তোমার মারে আমি তাড়াতে আছি নাই। ছে হইছে গিয়া হীরার টুকরা। তার মতো মানুছ হয় না। আমি যা চেয়েছি তার চেয়েও বেছি পাইছি। ছেটা

তোমার আম্মা দিছে। আমি চাই না আমার জন্যে তুমি কষ্ট পাও। আমি তোমারে বলব না আমারে আম্মা ডাকতে। আমি ছুধু চাই তুমি আমাকে মেনে নাও। ভালো থাকো। হাছিখুছি থাকো। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। তোমরা যেমনে বলবা আমি তেমনেই চলব। এইযে দেখো,তোমার ছাজগোজ পছন্দ না বলে আমি আজ ছাজি নাই। আর কোনোদিনও ছাজব না। আমি কী কম ছুন্দর নাকি যে ছাজতেই হবে।’

পূর্ণার মন ছুঁতে পেরেছে বাসন্তীর কথা। পূর্ণা বরাবরই কোমল মনের। তবুও শক্ত কণ্ঠেই বলল, ‘আমি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করব না। আপনি আপনার মতো থাকুন প্রেমা,প্রান্তকে নিয়ে। আমি আমার মতো থাকব আমার মাকে নিয়ে। আমার আর কারোর বন্ধুত্ব্ব দরকার নেই।’

বাসন্তীর চোখ ছলছল করছে। তবুও তিনি হাসতে কার্পণ্য করলেন না। বললেন,’তোমার চুল অনেক ছুন্দর আর লম্বা। এখন তো ভরদুপুর। বাইন্ধা রাখো।’
পূর্ণা চুলগুলো হাত খোঁপা করে নিল। এরপর বলল, ‘আম্মা এখনও ঘুমে?’
‘হ।’
‘আম্মার কী যে হয়েছে। কখনো একদমই ঘুমায় না। আর কখনো ঘুম ছেড়ে উঠতেই পারে না। ‘
‘পদ্মজার জন্যে কান্ধে দেখি। ছরীর দূর্বল হয়ে পড়ছে। এজন্যই ঘুমাচ্ছে।’
পূর্ণা উঠে দাঁড়ায়। বাসন্তী বললেন,’আমি রানছি বলে ছকালে খাইলা না। এখন নিয়া আছি ভাত?’
‘পরে খাব।’ বলে পূর্ণা দ্রুত পায়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

হেমলতার ঘরে এসে দেখল,তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চুল ছড়িয়ে আছে বালিশে। কেমন শুকিয়ে গেছেন। এতক্ষণ না খেয়ে থাকলে তো আরো শুকাবে। ডাকা উচিত। পূর্ণা ডাকল, ‘আম্মা....আম্মা।’
হেমলতা সাড়া দিলেন না। পূর্ণা ঝুঁকে হেমলতার গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, ‘ও আম্মা। উঠো এবার। দুপুর হয়ে গেছে। আম্মা...ও আম্মা।’
হেমলতা চোখ খুলেন। চোখের মণি ফ্যাকাসে। তিনি উঠতে চাইলে হুট করে হাত কাঁপতে থাকল। পূর্ণা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল,’কী হয়েছে আম্মা?’

হেমলতা কিচ্ছুটি বললেন না। পূর্ণা হেমলতাকে ধরে উঠাল। হেমলতা পূর্ণার দিকে চেয়ে থেকে ক্ষীন স্বরে প্রশ্ন করেন, ‘কে তুমি?’

চলবে...